চকবাজারের ইফতার: ঐতিহ্য ও আভিজাত্য

হাসান নীল

ভোররাতে সেহরি খেয়ে রোজা রাখে দেশের মুসলমান সম্প্রদায়। এই রোজা পূর্ণতা পায় সন্ধ্যায় ইফতারে। ইফতার ঘিরে রোজদারদের মধ্যে আয়োজনের ঘাটতি থাকে না। ইফতারি চান একটু মুখরোচক ও তৃপ্তিদায়ক। এ লক্ষ্যে বাড়ির গৃহিনীরা তো দুপুর থেকেই ইফতারের যোগাড়যন্ত্র শুরু করে দেন।

পুরুষরা দুপুর গড়াতেই কাজ সেরে রওনা হন ইফতার কিনতে। রোজার মাসে শহরের অলিগলি সর্বত্র ব্যবসায়ীরা নানা পদের মুখরোচক খাবারের পসরা সাজিয়ে বসেন ইফতারের সময়। বিকেল হতেই সেসব জায়গায় লোক সমাগম হতে থাকে। ইফতারের ওই ভিড় দেখার মতো। সূর্যটা যখন পশ্চিমে হেলে পড়ছে তখন খোলা আকাশের নিচে গনগনে আগুনে ডুবো তেলে জিলাপি, পেঁয়াজু, আলুর চপ, বেগুনিসহ হরেক পদের ভাজাপোড়া তৈরি হতে থাকে। দোকানিরা বিকিকিনিতে ব্যস্ত।

রাজধানীর বিশেষ কিছু স্থানের ইফতারির সুনাম নগরবাসীর মুখে মুখে। এরমধ্যে অন্যতম চকবাজারের ইফতার। অনেকেই ঢাকার অন্যপ্রান্ত থেকে ক্লান্তি-যানজট উপেক্ষা করে চকবাজারে ছুটে আসেন ইফতার কিনতে। চকবাজার ঢাকা শহরের একটি ব্যস্ত এলাকা। সুই থেকে শুরু করে কাফন, সবই পাওয়া যায় এখানে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা এই বাজারে আসেন পণ্য কিনতে। তবে রোজার মাসে এখানকার চিত্রটা একটু অন্যরকম। এ সময় ব্যস্ততার সাথে যোগ হয় আয়োজন ও উৎসবের। এই আয়োজন ইফতারির। এ সময় চকের অলি গলি সর্বত্রই ইফতার বিক্রির ধুম পড়ে যায়। বিক্রি জমে ওঠে শাহী মসজিদকে কেন্দ্র করে। তবে ক্রেতাদের ভিড় সামলাতে মূল রাস্তার দুই পাশে বসে যায় ইফতারির দোকান।

চকবাজারের ইফতারির ইতিহাস জানতে চলে যেতে হবে আজ থেকে চার শ বছর পেছনে। সে সময় বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছিল চকবাজার। শোনা যায়, ১৭০২ সালে এই বাজারের আধুনিকায়ন করেন তৎকালীন বাংলার মোঘল সুবেদার মুর্শিদ কুলী খাঁ। তখন থেকেই রোজার মাসে এখানে প্রচলন শুরু হয় ইফতারি বিক্রির। মোঘলদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল বলে আজও এখানকার ইফতারিতে রয়েছে মোঘলাই খাবারের আধিপত্য। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে পুরান ঢাকার মানুষদের মশলাদার ও মুখরোচক খাবারের স্বাদ। এখানকার ইফতারিতে আভিজাত্য ও ঐতিহ্য দুটোর ছাপই লক্ষণীয়।

চকের ইফতারের অন্যতম অনুষঙ্গ ঝাল খাবার। হরেক রকম ঝাল ও মশলাযুক্ত মোঘলাই খাবারে সেজে ওঠে খাবারের ডালি। মোঘলদের আস্ত মুরগির রোস্ট থেকে শুরু করে কাবাব, বিরিয়ানিসহ নানান পদ পাওয়া যায়। এসবের আবার রয়েছে বিভিন্ন নাম। যেমন জালি কাবাব, আস্ত মুরগির রোস্ট, কোয়েলের রোস্ট, রুমালি রুটি, কবুতরের রোস্ট, খাসির গ্লাসি, বটি কাবাব, শামি কাবাব, সুতি কাবাব, খাসির লেগ রোস্ট, শিক কাবাব, হারিয়ালি কাবাব, কোফতা কাবাব।

ইফতার শেষে রয়েছে ভারী খাবারের আয়োজন। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পরোটা, পোলাও, মাংস। আছে কাচ্চি, তেহারি, দম বিরিয়ানি, কাবুলি পোলাও, চাপ পোলাও, হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি, নবাবি বিরিয়ানি ইত্যাদি। অনেকেই হয়তো ভাবছেন, চক বুঝি শুধু ঝাল খাবারের মিলনমেলা। বিষয়টি একেবারেই তেমন নয়। বলতে পারেন এটি চকের ইফতারের একাংশ। ইফতার শুরু হয় পানি কিংবা শরবত দিয়ে। ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী পানি, খেজুর কিংবা একটু মিষ্টি মুখে নিয়ে ইফতার করা ভালো। এ কারণে ইফতারে মিষ্টান্নের প্রাধান্য থাকে। মিষ্টি জাতীয় খাবারেরও কমতি নেই চকে। ফিরনি, দই, জর্দা, শাহী টুকরা, লাড্ডু, মনসুর, খাজালা গুরুসহ

নানান পদের মিষ্টান্ন জাতীয় খাবারে সেজে ওঠে এখানকার দোকান।

চিকিৎসকদের মতে রোজদারদের জন্য ইফতারিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তরল খাবার। রোজাদারদের শরীরে পানি ঘাটতির আশঙ্কা থেকে যায়। চকের ইফতারে পাওয়া যায় হরেক রকম শরবত ও পানীয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য জাফরানি শরবত, কুলফি মালাই, লাচ্ছি, ফালুদা, লেবুর শরবত, পেস্তা বাদামের শরবত, মাঠা, লাবাং, তোকমা দানার শরবত, বেলের শরবত, গুড়ের শরবত।

এছাড়া ছোলা, ঘুগনি, পেঁয়াজু, মুড়ি, বুন্দিয়া তো থাকছেই। আজকাল চকে মোঘল আমলের ঐতিহ্যবাহী খাবারের সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও কিছু খাবার। এসবের মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে 'বড় বাপের পোলায় খায়' নামের একটি খাবার। অদ্ভুত নামের এই খাবারের কথা শুনে আশ্চর্য হতে হয়। তেমনই এর জনপ্রিয়তাও চোখ কপালে ওঠার মতো। পুরান ঢাকার সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন খাবার এটি। ইফতারি কিনতে আসা রোজাদারদের পছন্দের তালিকায় প্রথম দিকে থাকে বড় বাপের পোলায় খায়।

ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে সব দোকানেই রাখা হয় বড় বাপের পোলায় খায়। স্থানীয়দের মতে হাজী শহীদ বাবুর্চিই এ খাবার জনপ্রিয় করতে বেশি অবদান রেখেছেন। ৩৬ পদের উপকরণ ও ১৮ পদের মশলা দিয়ে তৈরি হয় এটি। বলা হয়, হরেক রকম খাদ্যউপাদানে বানানো হয় বলে এ খাদ্যের পুষ্টিগুণও বেশি। তবে এ খাবারের সুনামের পাশাপাশি দুর্নামও কম নেই। হরেক পদের মিশ্রণে বানানো হয় বলে অনেকেই এটি মুখে দিতেও চান না। এ নিয়ে ছোট একটি ছড়াও রয়েছে। সেটি হলো,

বড় বাপের পোলায় খায়
ঠোঙ্গায় ভইরা লিয়া যায়
এযে ডাহা মিছা হায়
এই জিনিষ মাইনসে খায়!

অনেকের মতে এ খাবার যে একবার মুখে দিবে দ্বিতীয়বার আর সে ওমুখো হবে না। নানান উপকরণ দিয়ে তৈরি বলে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন এটি একেবারেই ভুল তথ্য। তাদের মতে এতে এসিডিটি ও পেটের পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই লোভনীয় হলেও এটি পরিত্যাজ্য বলেই মনে করেন তারা। কিন্তু তাতে বড় বাপের পোলায় খায় নামক খাবারের বয়েই গেছে। বদনাম উপেক্ষা করে ক্রেতারা এই খাবারের দোকানে ভিড় করেন। অপেক্ষা করেন দীর্ঘ সময়। এটি কিনেই ঘরে ফেরেন তারা। অনেকে শুধুমাত্র ৬৮ বছরের পুরোনো এই খাবারটির টানেই দূর-দূরান্ত থেকে আসেন চকবাজার।

এক সময়ে চকবাজারের ইফতার বিক্রেতারা বছরের পর বছর এ পেশা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করত। খাবারগুলোর জন্ম ইতিহাসও নখদর্পণে ছিল তাদের। কিন্তু আজ তেমনটা দেখা যায় না। আজকাল এখানকার ইফতার বিক্রেতাদের অধিকাংশই মৌসুমি বিক্রেতা। সারা বছর অন্য কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন; রমজানে বাড়তি কিছু আয়ের আশায় ইফতার বিক্রি করেন। চকবাজারে ঐতিহ্যবাহী ইফতার নিয়ে মাথাব্যাথা নেই। এখান-ওখান থেকে বিভিন্ন ধরনের ইফতার সামগ্রী পাইকারি কিনে এনে নতুন নাম দিয়ে চকের ইফতার বলে চালিয়ে দেন।

উদাহরণ হিসেব বলা যায় হারুনের দোকান, আকবরের দইবড়া। এসব দোকানের কোনো অস্তিত্ব থাকে না সারা বছর। কিন্তু রমজান মাস এলেই জুড়ে বসে শাহী মসজিদের আশেপাশে। তারপর হাঁকডাক করে বিকিকিনি শুরু করে দেয়। মনে হয় মাত্র নিজ হাতে দোকানি নতুন কোনো খাবার তৈরি করে সগৌরবে বিক্রি করছে। এরকম আরও অনেকে আছে। এরা ফালুদা, লাবাং ইত্যাদি চাহিদা রয়েছে এমন ইফতার সামগ্রীর আগে নিজেদের নামজুড়ে ব্যবসা পেতে বসে। প্রশ্ন করলে ব্যস্ততার ভান করে অন্যদিকে মনযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে।

এতো গেল এক গল্প। আরও ভয়ংকর তথ্য হচ্ছে চকবাজারের ইফতারির ঐতিহ্যকে ঢাল করে অসাধু ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত লাভ করছে। রমজান এলেই শুরু হয় এদের দৌরাত্ম্য। পচা-বাসী সামগ্রী দিয়ে ইফতার তৈরি করে ক্রেতাদের নিয়মিত ঠকিয়ে থাকে এরা। পাশাপাশি এদের ভ্রাম্যমাণ দোকানগুলোও পাতা হয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। খোলা নর্দমার পাশেই এরা সাজিয়ে বসে ইফতারির পসরা। ফলে খাবারে বসে নর্দমার মশা-মাছি। খাবারে থাকে নানা রোগজীবাণু। এদের দৌরাত্ম্যে চকবাজারের আদি ইফতারি ব্যবসায়ীদেরও নাকাল দশা। প্রতিবছরই গণমাধ্যমে এদের দৌরাত্ম্যের কারণে নিজেদের লোকসানের কথা জানান, আলাউদ্দিন সুইটমিটসসহ বিভিন্ন পুরান ঢাকার দোকান মালিকরা। এদিকে ভোক্তা অধিকার আইন অমান্য করায় মাঝে মাঝেই জরিমানা হয় ওই অসাধু ব্যবসায়ীদের। গুনতে হয় জরিমানাও। কিন্তু তাতেও ফল হয় না। পরদিনই আবার দোকান খুলে বেচাবিক্রি শুরু করে দেয় তারা।

চকবাজারে একসময় ইফতারি বানানো হতো ঘিয়ে ভেজে। আজ এরা ইফতারি বানায় কয়েক দিনের বাসি ও পোড়া তেলে ভেজে। নানান রকম পচাবাসি উপকরণ মিলিয়ে তা ভেজে সাজিয়ে বসে খাবারের ডালা। এ খাবারগুলো যে খাওয়ার অযোগ্য তা গন্ধই বলে দেয়। একারণেই ক্রেতাদের ইফতার কিনতে বাইরের খাবার এড়িয়ে চলতে বলা হয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! চকবাজারের ইফতারির সুনামের কাছে এসব সতর্কীকরণ অনেক সময়ই চাপা পড়ে যায়। দূর-দূরান্ত থেকে আসা ক্লান্ত ক্রেতাদের এতো ঝাক্কি পোহানোর ধৈর্য বা সময় কোনোটাই থাকে না। তাই সব ভুলে তারা সুবিধামতো জায়গা থেকে কোনোমতে ইফতার সমগ্রী কিনে বাড়ি ফিরে যান। ইফতারির টেবিল সাজিয়ে তোলেন ঐতিহ্যমণ্ডিত ও আভিজাত খাবারে। এভাবেই চলছে দিনের পর দিন।